সংবাদ

22 FEB 2017
পৃষ্ঠা ...

সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা

অমিত রায় চৌধুরী

১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতিকে আমলে নিয়েও বঙ্গবন্ধু ৩৭,০০০ প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেন। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাঙালি আজ বিশ্বসভায় মর্যাদা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প এখন ক্রমশ বিকাশমান। বাংলাদেশ এখন তারুণ্যের জোয়ারে প্লাবিত। এই 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট' অর্থাৎ পনের থেকে চল্লিশ বছরের এই বিশাল তারুণ্যেকে যথার্থ অর্থে দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করাই আমাদের সমকালীন চ্যালেঞ্জ। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নে অর্থবহ বিনিয়োগ বিশাল তারুণ্যশ্রয়ী জনবলের সুবিধা এনে দিতে পারে। তারাই হতে পারে দিন বদলের হাতিয়ার। অন্যদিকে বলছে তারুণ্যের শতকরা চল্লিশভাগ এখনও নিষ্ক্রিয়। সকল কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ জনবলে রূপান্তর করতে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহত্তর অর্থবাজারে কাজের সংস্থান করতে হবে। যার জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা ও কার্যকর প্রশিক্ষণ। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা: দেশের মোট ৮২,২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩,২৫,০০০ শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক স্তরসহ প্রায় ২,৫০,০০,০০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করে থাকেন; যা বিশ্বের বৃহত্তম প্রাথমিক শিক্ষা নেটওয়ার্কের অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্গত আদর্শিক চেতনায় উজ্জীবিত নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র সমান সুযোগ নিশ্চিত করে আধুনিক, বৈষম্যহীন ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখবে এমন আকাঙ্ক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রত্যাশিত হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে এখন বাংলাদেশে প্রায় বারো ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু আছে।

পিইডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সকল শিশুকে শিক্ষা বছরের প্রথম দিনে ৩৬.২১ কোটি নতুন বই সরবরাহ, ভৌগোলিক চাহিদা অনুযায়ী এক হাজার পাঁচশ স্কুল নির্মাণ, শিশু শ্রেণীর প্রবর্তন, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি, শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ, ৩০,০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ৪৫ : ১ এ নামিয়ে আনা, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ ১,৩০,০০,০০০ শিক্ষার্থীকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তির আওতায় আনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিশাল কর্মযজ্ঞ সরকার পরিচালনা করছে।

মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায়: মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দর্শনের বিভিন্নতা, অঙ্গীকার রক্ষায় সদিচ্ছা ও ধারাবাহিকতার অভাব ও সমাজ মানসে ন্যায়ভ্রষ্টতার আধিপত্যের কারণে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও এদেশে বৈষম্য নিরসন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

১. মূল্যবোধের অবক্ষয়: মনের গহীনে অবদমিত প্রবৃত্তির আগ্রাসনে মাঝেমধ্যে মানুষের আচরণে বিচ্যুতি ঘটে, নিজে একা বাঁচার অলীক নেশা তাকে মত্ত করে তোলে, অন্যকে জায়গা না দিয়ে ভোগবাদী আমিত্ব আদিম স্বার্থ সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। গন্তব্য স্থির করে পথ, কালো কিংবা সাদা, ভালো না মন্দ-ভ্রুক্ষেপ নেই। ন্যূনতম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মুনাফা। ছুটছে মানুষ দিশাহীন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কর্মকর্তা, সমাজ, রাজনীতি- কাতারবন্দী, একাকার।

২. শিক্ষক: শিক্ষকের মেধা, যোগ্যতা ও পেশার প্রতি নৈতিক বিশ্বস্ততা ছাত্র-ছাত্রীর শিখন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অনুঘটক। অন্যদিকে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাব, নিম্ন বেতনক্রম, যোগ্যতর প্রার্থীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করে না, এমনকি ইতোমধ্যে নিযুক্ত উচ্চতর যোগ্যতা সংবলিত শিক্ষকগণও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হন। কর্মরত শিক্ষকদের আস্থা ও ব্যক্তিত্বের সংকট শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে শিশুর মনন বিকাশের পথে নিষ্পাপ চিত্রকল্পে শিক্ষকই তার আইকন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ স্তরে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ও অপ্রস্তুত শিক্ষকগণ নিযুক্ত হয়ে পড়ছেন কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। বিভিন্ন কারণে বিদ্যমান জনবল শহরমুখী হলে মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক সংকটে ভোগে।

৩. শিক্ষার্থী: মফঃস্বল ও শহরের দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী পরিবারের শিক্ষার্থীর একাংশ শিক্ষাসেবা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকে না। এসব ক্ষেত্রে বড় একটি অংশের প্রথম প্রজন্ম শিক্ষার্থী হিসেবে স্কুলে আসে। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতাই এসব ছেলে-মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন। শিক্ষকগণের নির্দেশনায় কোন ঘাটতি থাকলে তা সংশোধনের কোন সুযোগ থাকে না অথবা পাঠদান আনন্দময় না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঝরেপড়ার ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে শহরের নামিদামী বে-সরকারি স্কুলগুলিতে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে টিউশন ফিস শতভাগ বৃদ্ধির অভিযোগ রয়েছে; যার ফলে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অভিভাবকরা অতিরিক্ত ও অন্যায্য আর্থিক চাপের শিকার হয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এছাড়া ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগও নেহাত কম নয়।

৪. অভিভাবক: শিশুকে মানবিক, ন্যায়পরায়ণ ও অকপট হতে পরিবার অনুকূল পারিপার্শ্বিক নির্মাণ করতে না পারলে শিশুর মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক কিংবা হিংস্রতা সৃষ্টি হতে পারে। এই মনোজাগতিক শূন্যতা শিশুকে বিপদগামী করতে পারে। অভিভাবকের অসচেতনতা, অতিমাত্রায় সচেতনতা বা এককথায় অসংযমী উচ্চাশা অথবা অনেকাংশে দারিদ্র্য শিক্ষার্থীকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে না।

৫. মাঠ প্রশাসন: শিক্ষকগণের বদলি, স্কেল পরিবর্তন, পেনশন, প্রশিক্ষণ এমনকি কোন অভিযোগ নিষ্পত্তিকালেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিক্ষা বিভাগের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংগে একশ্রেণির শিক্ষকের অনৈতিক যোগসাজশে বদলি বাণিজ্যসহ নানা ধরনের অশুভ আঁতাত ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ন করে।

৬. পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম: শিক্ষাবছরের প্রথম দিনেই প্রতিটি শিশুর হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া একটি মাইলফলক হলেও পাঠ্যপুস্তকের মান, বিশেষ করে কিছু মুদ্রণত্রুটি, তথ্য বিভ্রান্তি, সংযোজন, বিয়োজন জনমনে নানা সংশয় সৃষ্টি করেছে। শিশুর বয়স ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা, গুণগতমান ও বিষয়বস্তুর পরিধি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, উগ্রবাদ ও নৈতিক অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মত নতুন নতুন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কারিকুলাম প্রস্তুতির প্রয়োজন।

৭. সৃজনশীল পদ্ধতি: শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান, প্রশ্নপ্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি শ্রেণীপাঠদান একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। শিশুর সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে এর বিকল্প নেই।

(ক)২০১০ এর জাতীয় শিক্ষানীতিতে শ্রেণীকক্ষে 'ইন্টারঅ্যাকটিভ টিচিং মেথড' এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা ব্যক্তি কিংবা দলভিত্তিক অনুশীলন উৎসাহিত করে। প্রক্রিয়াটি কার্যত শিক্ষকের গুণগত সামর্থ্য ও নির্ধারিত সময়ের ওপর নির্ভর করে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

(খ) পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু, অধ্যায় ও অনুশীলনীর মধ্যে অসংগতি, অতিসংক্ষেপিত উপস্থাপন শ্রেণী অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরল সংযোগ বাধাগ্রস্ত করে।

(গ) সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক পরিপক্বতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের জ্ঞাননির্ভর জবাব দেয়ার দক্ষতা অর্জন করা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অতিসংক্ষেপিত বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন কাঠামো নির্মাণ শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। RACE (Research For Advancement Of Complete Education) বলছে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের পাঁচবছর পরও ৫০% এর বেশি শিক্ষক এ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করেন না। ৪৭% লেসন তৈরির জন্য গাইড বইয়ের উপর নির্ভর করেন। ৯২% শিক্ষার্থী লেসন বোঝার জন্য গাইড বইয়ের সাহায্য নেয়। অথচ সৃজনশীল পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জন পাঠ্যবইয়ের পাঠ্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা ও তদপ্রেক্ষিতে সমাধানসূত্র আবিষ্কার করার বিধিবদ্ধ কাঠামোর ওপর।

৮. স্থানীয় সরকার, এমএমসি ও জন অংশীদারিত্ব: এসডিজি অর্জনের পথে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা সহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও শিক্ষাবান্ধব করার জন্য সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার, এমএমসি ও জনঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

৯. গাইড ও কোচিং বাণিজ্য: মূল্যবোধের অবক্ষয়, পেশার প্রতি আনুগত্যের অভাব, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় মেধা ও সামর্থ্যের অনুপস্থিতি, শ্রেণীকক্ষ পাঠদানকে আকর্ষণীয় করতে না পারা, নিম্নবেতনক্রম, পরীক্ষায় গ্রেড নির্ভর সাফল্য অর্জনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও যেকোন উপায়ে সাফল্য অর্জনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকের চাহিদার ঐক্য গাইড ও কোচিং বাণিজ্যের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছে। গাইড ও কোচিং বাণিজ্যের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল কারণগুলোকে শনাক্ত করে তার প্রতিকার বিধান করে দেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগ ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের এই অশুভ প্রবণতাকে রুখে দিতে না পারলে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

১০. পরীক্ষা ব্যবস্থা: প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের একাংশ মনে করেন এই পরীক্ষার আয়োজন একদিকে শিশুদের আনন্দময় পাঠ গ্রহণের পরিসরকে সংকুচিত করে অপরদিকে এই পরীক্ষাগুলোকে কেন্দ্র করে কোচিং, গাইড ও প্রশ্ন ফাঁস সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বেশিসংখ্যক অভিভাবক মনে করেন শহরের বিত্তবান অভিভাবকের সন্তানরা নামিদামী স্কুলে অনেক বেশি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাস্তবতায় সুঠিকভাবে গড়ে ওঠে এবং পাঠ প্রস্তুতিতেও তারা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অগ্রসর থাকে। সমাপনী পরীক্ষা দেশের সর্বত্র একইভাবে সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন করা না গেলে এবং পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন যথার্থ না হলে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি একদিকে যেমন সুবিচার হয় না, অন্যদিকে তাদের স্ব-মূল্যায়নের সুযোগও নষ্ট হয়।

সমস্যা নিরসনে সুপারিশ:

১. শিক্ষানীতি: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে একটি জ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে একুশ শতকের উপযোগী অগ্রসর ও মর্যাদাবান দেশ গঠনের লক্ষ্যে যে সুপারিশ করা হয়েছে তার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন দ্রুততম সময়ের মধ্যে করতে হবে।

২. শিক্ষকের মর্যাদা: শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পৃথক বেতন স্কেল দ্রুত প্রবর্তন করতে হবে। মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে।

৩. মাঠ প্রশাসন: পেশা ও নৈতিকতার প্রতি অনুগত নন এমন শিক্ষক অথবা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করতে হবে। মাঠ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি।

৪. ঝরেপড়া রোধ: শ্রেণীকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান শৈলী প্রয়োগ করে এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসহায় সন্তানদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় এনে ঝরেপড়া রোধ কল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কোচিং ও গাইড বাণিজ্য: কোচিং বাণিজ্য ও গাইড বইয়ের বিস্তার রুদ্ধের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

৬. এসএমসি: স্কুল পরিচালনা কমিটিতে নিবেদিত শিক্ষানুরাগী, হিতৈষী ও সমাজসেবীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭.কারিকুলাম ও পরীক্ষা: বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে অভিন্ন কারিকুলাম অচিরেই প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. সৃজনশীল পদ্ধতি: সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যথার্থ অর্থে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে শ্রেণী পাঠদান আকর্ষণীয় করতে হবে।

৯.অবকাঠামো উন্নয়ন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও শিক্ষাবান্ধব করতে হবে। ভবন সংস্কার অথবা নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে চাহিদার সঠিকতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা ব্যয় জিডিপি-র ২ থেকে ৬ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধকরণ: শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সেমিনার ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

প্রত্যাশা: এসডিজি-২০৩০ অর্জনের দৃঢ় অঙ্গীকারে সাম্যের ভিত্তিতে একীভূত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রো-এ্যাকটিভ হতে হবে। আমাদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সমান্তরালে বহমান গতিতে সকলের সমন্বিত তৎপরতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ পার হয়ে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে আমরা পৌঁছে যাব ২০৪১-এ। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি পরিণত হবে একটি সমৃদ্ধ, অভিজাত রাষ্ট্রে।

[লেখক : অধ্যক্ষ, ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, বাগেরহাট]
principalffmmc@gmail.com